রথের মেলা: আমাদের স্মৃতি

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়

বিজয় চাঁদ রোড, পূর্ব বর্ধমান

রথের মেলা: আমার স্মৃতি: এক

লেখা: রাস্না মন্ডল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ,ষষ্ঠ সেমিস্টার, 21)

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা পালিত হয়। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন দেবমূর্তিকে সুসজ্জিত রথে বসিয়ে পূজা সম্পন্নপূর্বক রথ টানা হয়। এই রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসে। আমার গ্রামে স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় একটি ছোট্ট মাঠে প্রতিবছর রথের মেলা বসতো। সাত দিন ধরে এই মেলা চলত। ছোটবেলায় সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম এই দিনগুলির জন্য।

বাবা-মার হাত ধরে মেলা ঢুকতে না ঢুকতেই বায়না শুরু করতাম নাগরদোলা চড়া, রান্নাবাটি কেনা, পাপড় ভাজা ও জিলিপি খাওয়ার। ভাই বিভিন্ন রকম খেলনা গাড়ির দোকান থেকে দু-তিনটি গাড়ি ধরে সেখান হতে নড়তোই না। বাবা অন্য দোকানে আরো ভালো খেলনা গাড়ি আছে বলে মেলায় ঘোরাতো। রথের মেলা থেকে রথ কেনার ধুম চোখে পড়তো। মনোহারী দোকানে মা কিছু সাজগোজের জিনিস কিনতো এবং আমাকেও কিনে দিতো। পরে চুপিচুপি সেই খেলনা সামগ্রী স্কুল ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধুদেরকে দেখাতাম। আমি বাড়ি ফিরে খুব কৌতুহলের সঙ্গে মাকে প্রশ্ন করতাম আবার কবে মেলা বসবে?

একবার মা আমাকে মেলা থেকে একটি গোপাল ঠাকুরের মূর্তি কিনে দিয়েছিল যেটি এখনো আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এখনো মনে পড়ে এক গরিব বৃদ্ধা আমার কাছ থেকে একটি ষোলআনা পেয়ে খুশি হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিল ‘বেটাটি সুখী হবে, বেটিটি সুখী হবে’। সেই বৃদ্ধার মুখের হাসি আজও আমার কাছে স্মৃতি হয়ে আছে। কিন্তু সেই মাঠে এখন আর রথের মেলা বসে না। সেখানে বর্তমানে একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে পেরোলে তাই আমার খুব মন খারাপ হয়।

রথের মেলা: আমার স্মৃতি: দুই

লেখা: সৌমি সাহা (পুষ্টিবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার,21)

ফিরবেনা জানি সময়টা আর
স্মৃতিগুলোই যে দিন গোনে
ছোট্টবেলার সেই রথের কথা
আজ কেবলই পড়ছে মনে।।
বৃষ্টি ভেজা আষাঢ়ের দিনে
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলে,
জিলিপি পাপড়ে মন মজাতো
ফিরতাম মেলায় দলে দলে।।

সময়তালে এগিয়ে গেছি
অতীতকে ভুলতে বসেছি আজ,
শৈশব আজও ডাকছে কেঁদে,
হারিয়ে গেছে রথের সাজ।।
রথ সাজানোর রঙিন কাগজ
এখনো আছে আগেরই মতো,
শুধু রাতটা যদি থাকতো কাছে
সত্যিই কত ভাল হতো।।

সময় এর ধারা তার নিজস্ব গতিতে বয়ে চলেছে, কিন্তু কিছু ঘটনা বা উৎসব তার ধারাবাহিক উপস্থিতির অন্যথা করেনি। যেমন রথযাত্রার বছরের এই দিনটি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে। যাই হোক এবার আসি নিজের কথায়। তখন আমি খুব ছোট, রথযাত্রা উৎসব মানে আমার কাছে এক বিশাল আয়োজন। রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হওয়ার দিন পাঁচেক আগে থেকে আমি নিজের মতো করে প্রস্তুতি শুরু করে দিতাম। বাবা বাজার থেকে রথ কিনে আনলে সেই রথ সাজানোর কাজেই আমি সারাদিন ব্যস্ত হয়ে থাকতাম। অবশেষে আসতো সেই খুশির দিন রথযাত্রা উৎসব।

আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে একসাথে সকাল-সকাল সেই রথ নিয়ে রাস্তায় বের হতাম। জগন্নাথ, বলরাম, আর সুভদ্রার রথ নানান ফুলের ছোঁয়ায় একটা বিশেষ মাত্রা পেত। দু চোখ ভরে তাকিয়ে থাকতাম আমার রথের দিকে। রথের রশি টেনে আশেপাশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। আমার মা রথের মধ্যে আগে থেকে কিছু প্রসাদ ঢুকিয়ে দিতে রেখে দিতেন। পথচলতি কেউ যদি রথ স্পর্শ করে প্রণাম জানায়, তার হাতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ তুলে দেওয়ার জন্য। এই ভাবেই কিছুক্ষণ ঘোরার পর আমরা সকলে বাড়ি ফিরে আসতাম। তারপর দুপুর বেলা জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হতো। আমি আর আমার বন্ধুরা সবাই মিলে একসাথে খেতাম কারণ ওইদিন আমার মা আমার সকল বন্ধুদের আমাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করতেন।

আর একটি বিশেষ ব্যাপার ঘটতো ওইদিন বিকেল বেলায়। সেটা হল রথের মেলা দেখতে যাওয়া। বাবা মার হাত ধরে আমি রথের মেলায় ঘুরতে যেতাম। আর রথের মেলায় পাপড় ভাজা ও জিলিপির আস্বাদ না নিয়ে ঘরমুখো হতাম না। মেলায় গিয়ে বিভিন্ন রকম খেলনা ও কাঠের পুতুল কেনা ছিল রীতিমতো আমার একটি শখ। রথের মেলায় গিয়েও তার অন্যথা হতো না। মাকে দেখেছি ঘরকন্যার জন্য অনেক জিনিস কিনে আনত রথের মেলা থেকে।

রথের মেলায় আমি নাগর দোলায় চড়তাম আর নাগরদোলা থেকে নেমে মনে হতো আমাকে দাড় করিয়ে আমার আশেপাশের মানুষজন তীব্রবেগে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। খানিক পরে স্থিতাবস্থা আসতো। এরজন্যই বাবা খুব রাগ করতেন, কিন্তু আমি পরের দিন আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতাম ও নাগরদোলায় চড়ার জন্য বায়না জুড়ে দিতাম। আজ এত বছর পরেও মনে হয় এইতো সেদিনের কথা, চেষ্টা করলেই হাত বাড়িয়ে দিন গুলো ছোঁয়া যায়। সময়ের সাথে সাথে মানুষের জীবন চর্চার কত বদল হয়েছে। পুরনো কে সরিয়ে নতুনের আসন তৈরি হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের মাঝে, স্মৃতির মণিকোঠায় আজও জেগে আছে রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে অনেক অনেক স্মৃতি।

রথের মেলা: আমার স্মৃতি: তিন

লেখা: অনন্যা পাল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।।
পথ ভাবে আমি দেব' রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত এই পংক্তিগুলোর সাথে আমরা চিরপরিচিত। রথ শব্দের আভিধানিক অর্থ যুদ্ধযান বা চাকা যুক্ত ঘোড়ায় টানা হালকা গাড়ি। পৌরাণিক কাহিনীতে রথে ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রেই দেখা যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি গড়ে তুলেছিলেন শ্রী ক্ষেত্র মন্দির বর্তমানে যা জগন্নাথধাম নামে পরিচিত। কিন্তু মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না। নীলমাধবের দর্শন পেয়ে বিদ্যাপতি নামের এক ব্যক্তি ভক্তিভরে তাঁর পূজা করেন এবং শুনতে পান দৈববাণী। "এতদিন আমি দীনদুঃখীর পুজো নিয়েছি, এবার আমি মহা উপাচারের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নিতে চাই।" এই দৈববাণী শুনে উৎফুল্ল বিদ্যাপতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কে জানালে, তিনি জঙ্গলে পৌঁছান এবং শুনতে পান অপর দৈববাণী, "সমুদ্রের জলে ভেসে আসবে যে কাঠ সেই কাষ্ঠ খন্ড থেকেই তৈরি হবে বিগ্রহ।" (নীলমাধবের বিগ্রহ)।
শুরু হলো সেই ভেসে আসা কাঠ দিয়ে মূর্তি নির্মাণের কাজ। স্বয়ং জগন্নাথ শিল্পী রূপ ধরে মূর্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন এবং শর্ত দিলেন তিন সপ্তাহ অর্থাৎ 21 দিনের পূর্বে কেউ তার মূর্তি নির্মাণ দেখতে পারবে না। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী গুচিন্ডার তর সইলো না। অত্যন্ত আগ্রহে তিনি মূর্তি নির্মাণের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন কারিগর উধাও এবং তিনটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তি। মূর্তির না আছে হাত, না আছে পা। শর্ত লন্ডনের ফলেই এরূপ হয়েছে এই অনুশোচনায় দুঃখে বিহ্বল হয়ে যাওয়া রাজার স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে জগন্নাথদেব জানান "এমনটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি এই রূপে পূজিত হতে চাই।" এর পর থেকে জগন্নাথদেব এই রূপে পূজিত হন। রথের সাথে জড়িয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের নাম যার একরূপ জগন্নাথ। বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রা দেবী তিনজনই একে অপরের ভাই বোন। তাদের তিন ভাইবোনের ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহপরায়ণ সম্পর্কের জন্যই তারা পূজনীয়। রথযাত্রা তাদেরকে কেন্দ্র করেই। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির যেখানে মহাসমারোহে রথযাত্রা পালিত হয়। পুরান কাহিনী অনুসারে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে রথের চড়ে দাদা বলরাম ও সুভদ্রা কে দেখতে যান জগন্নাথদেব। এর সাতদিন পর মন্দির থেকে ভাই বোনকে নিয়ে জগন্নাথদেবের ফিরতি যাত্রা কে উল্টো রথযাত্রা বলা হয়।
তবে বর্তমানে রথযাত্রার সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কাঠের তৈরি করে বিগ্রহকে পরিভ্রমণ করানো হয়। কালক্রমে এটি হয়ে উঠেছে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষের মিলন তীর্থ।
বর্ধমান নিবাসী হওয়ার সুবাদে আমার রথের মেলা কাটানোর স্মৃতি বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়িতেই আবদ্ধ। এখনো পর্যন্ত রথ দেখতে পুরী যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে বাড়িতে বসে টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট উপভোগ করেছি কিন্তু তা মোটেই হৃদয়স্পর্শী নয়। রথের মেলা বলতেই প্রথমে যা মনে পড়ে তা হলো মেলায় গিয়ে জিলিপি, পাপড় ভাজা খাওয়া আর ছোটবেলায় উপরি পাওনা ছিল নানান ধরনের খেলনা। রথের দড়ি টানতে শত শত মানুষের ভিড়, আর উচ্চস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ এসবের মধ্য দিয়েই আমার রথের দিনগুলো কেটেছে। আর একবার ছোটবেলায় বাড়িতে নিজের চেষ্টায় পেপার, কার্ডবোর্ড কেটে রথ বানিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় আমি ও আমার বন্ধুরা মিলে টেনেছিলাম এবং অনেকেই শ্রদ্ধাভরে যে কয়েকটা টাকা আমাদের দিয়েছিল তা দিয়ে কিছু কিছু দুঃস্থ বাচ্চাদের খাবার কিনে দেওয়া স্মৃতি আমার কাছে খুবই আনন্দের এবং চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমাকে পুনরায় এই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। কলেজ থেকে না-বলা হলে হয়তো স্মৃতিগুলো কাগজের পাতায় ঠাঁই পেত না।

রথের মেলা: আমার স্মৃতি: চার

লেখা: ঝিমলি কোনার (পুষ্টিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তবুও যেন বাঙালির মন প্রাণ কোনটাই ভরেনা। ঠিক সেই রকমই বৈশাখ মাসে নববর্ষ পালনের পর বেশ কিছু মাস অপেক্ষা করে বাঙালি আবার মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে। আর সেই উৎসব শুধু উৎসবই নয়, সে এক মানুষের মিলনক্ষেত্র। হ্যাঁ, রথের মেলা মানেই হলো এক বিশাল মিলন ক্ষেত্র যেখানে মানুষ ধর্ম-বর্ণ-জাতি সবকিছু ভুলে গিয়ে একসাথে মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে। রথযাত্রা হলো সেই পবিত্র দিন যেদিন জগন্নাথদেব বলরামদেব এবং তার বোন সুভদ্রা দেবী স্বয়ং রথে চেপে মাসির বাড়ি রওনা হন। রথটিকে সাজানো হয় অসম্ভব সুন্দর ফুলের সাজে আর তা দেখার জন্য বহু মানুষ একত্রে জড় হন। রাস্তার আশেপাশে বসে কিছু খাবারের দোকান, কিছু খেলনার দোকান, কিছু জিনিসপত্রের দোকান – আর তাই রথের মেলা নামে পরিচিতি পায় আমাদের কাছে।

ছোটবেলায় রথযাত্রা আসার এক সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হতো আমার ছোট রথ বানানোর প্রচেষ্টা। প্রথমে পাড়ার দোকান থেকে কিনে আনা হতো রথ বানানোর, ও রথ সাজানোর সরঞ্জাম। তারপর বাবা-মা ও আমার সহযোগিতায় তৈরি হতো আমার সেই ছোট্ট তিন তলা রথ। নিচের তলায় থাকতেন ভগবান বলরামদেব, মাঝের তলায় সুভদ্রাদেবী এবং একদম উপরের তলায় থাকতেন জগন্নাথদেব। রথের দিন সকাল বেলায় বাগান থেকে ফুল তুলে বানিয়ে ফেলতাম সবার জন্য ফুলের মালা। সেই মালার সাজে কি সুন্দরীই না লাগতো আমার রথটিকে। সব শেষে মায়ের সাথে বসে পুজো করে জানাতাম আমার মনের প্রার্থনা।

তারপর দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া করে ওঠার পর মা বলতো "আজ আর দুপুরে ঘুমোতে হবে না, পড়তে বস। তবেই বিকেলে রথের মেলা নিয়ে যাবা" মন না থাকলেও অগত্যা বই খাতা নিয়ে বসতেই হত। তাও ভয়ে ভয়ে থাকতাম বিকালে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলেই তো আর যাওয়া হবে না। রথের দিন বৃষ্টি হবেনা এ খুব কম বছরই আছে। একচোট বৃষ্টি হয়ে যাবার পর যখন রাস্তা কাদায় ভরে যেতো, তখন বাবার সাইকেলে চেপে বেরিয়ে পড়তাম রথের মেলায় রথ দেখতে। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে চাপাচাপি করে ঢুকেও যখন কিছুই দেখতে পেতাম না তখন বাবা আমাকে ঘাড়ে চাপিয়ে নিতো। তারপর সেই সোনালী রথ দেখে কি যে ভাল লাগত তা হয়তো বোঝানো যাবেনা। রথটা কাছাকাছি এলে সেই রথের দড়ি ছুঁয়ে আসতাম আর রথ চলে যেতো তার গন্তব্যে। এরপর শুরু হতো আমার আবদার - "বাবা আইসক্রিম খাবো"। বাবা বলতো "আইসক্রিমগুলো পচা জল দিয়ে তৈরি খেলে নাকি পেটে লাগবে।" তারপর বলতাম 'তাহলে খেলনা কিনে দাও'। বাবাও মেয়ের আবদার মেটাতে কিছু একটা কিনেই দিতো। বাড়ির সবার জন্য রথের মেলা থেকে বাবা জিলিপি আর পাঁপড় কিনতো। তারপর আমরা বাড়ি ফিরতাম। সত্যিই সে এক অসম্ভব সুন্দর দিন ছিল।

আজ হয়তো আমরা বড় হয়েছি, তখনকার মতো আর বাবা মায়ের হাত ধরে রথের মেলা যাওয়া হয় না। তবে এখনকার দিনে রথের মেলায় গিয়ে সেটাকে উপভোগ না করে চারটি ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার থেকে ছোটবেলায় রথের মেলা আমাদের অনেক গুণ বেশি আনন্দ দিত। কিন্তু আজকের দিনে বাচ্চারাও এই মহামারীর কবলে পড়ে এসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায়। তাই আশা রাখি পৃথিবী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক এবং সবাই ভালো থাকুক।

রথের মেলা: আমার স্মৃতি: পাঁচ

লেখা: মোনালিসা মন্ডল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

মেলা হল কোন একটি বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে জাতি-বর্ণ-ধর্ম আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে একই জায়গায় একই সময়ে বহু মানুষের মিলনস্থল। সামাজিক সভ্যতার আদি থেকেই মেলা মানুষের চিরাচরিত সমাজ জীবনের এক বিশেষ স্থান বহন করে এসেছে। আগেকার দিনে মেলা বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে সীমিত হলেও বর্তমানে শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। মেলা মানেই শহর-গ্রামের মানুষের মেলবন্ধন যা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বিনোদনহীন, নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে আনন্দের জোয়ার নিয়ে আসে মেলা। আধুনিক যুগে মেলার ব্যাক্তি স্বাভাবিক চিরাচরিত গণ্ডি পেরিয়ে বহু ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজাত মাত্রা লাভ করেছে।

মেলা অনেক ধরনের হয় যেমন - পৌষ মেলা, শ্রাবণী মেলা, শিল্পমেলা, বইমেলা, বৈশাখী মেলা প্রভৃতি। এদের মধ্যে অন্যতম হলো রথের মেলা। সাধারণত বর্ষাকালে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে রথের মেলা বসে।
আমার দেখা একটি প্রিয় পছন্দের মেলা হল দুর্গাপুরে আয়োজিত হওয়া রথের মেলা, যেখানে প্রতিবার জাঁকজমকভাবে রথের মেলা পালিত হয়। এই মেলা চলে এক থেকে দুই সপ্তাহ। রাস্তার ধারে এক বিশাল ফাঁকা মাঠে এই মেলা সুসজ্জিত হয়। মেলার মাঝখানে তিনটি রথ তৈরি করা হয় এবং সেগুলিকে ফুল প্রদীপ আলো দিয়ে সজ্জিত করা হয় যেটা মেলার অন্যতম আকর্ষণ।

মেলায় দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে দোকানদাররা আসে। তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। বাংলাদেশের এইসব মেলা গুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় এদেশের হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী যা বাঙালির ঐতিহ্য ধারক ও বাহক বলে পরিচিত। মেলায় দোকান গুলি সুশৃংখলভাবে সাজানো থাকে। দোকানগুলিতে কেনাবেচার ভিড়, দোকানদারদের সমবেত কণ্ঠের আহ্বান, রংবেরঙের নানান রকম চুড়ি, মেয়েদের বিভিন্ন জিনিসপত্র - কানের দুল, চিরুনি, বেতের বোনা কুলো, লোহার হাতা খুন্তি ও বাসনপত্র, বাচ্চাদের খেলনা বাটির জিনিসপত্র, তালপাতার পাখা বাঁশের বাঁশি, মাটির পুতুল, মাটির হাড়ি, জামাকাপড়, ব্যাগের দোকান, ঠাকুরের ছবি ইত্যাদির মধ্যে দিশেহারা ক্রেতা কোনটা কিনবে ঠিক করতে পারে না। এছাড়াও সারি সারি চিনা বাদাম ভাজার দোকান, বালির মধ্যে গরম গরম চিনাবাদামের সুমধুর গন্ধের সঙ্গে মিশে যায় পাপড় ভাজা ও জিলিপি গন্ধ। মেলার মুখ্য আকর্ষণ হলো ফুচকার দোকান আর ঘুগনি দোকান। এছাড়াও খাবার দোকানের কোন অন্তই থাকে না – এগ রোল মোগলাই এর দোকান, কাটলেটের দোকান, ঝালমুড়ি আর ভেলপুরির দোকান, মোমোর দোকান, চাওমিন এর দোকান আরো কত কি!!! মেলায় গিয়েছি, অথচ খাবারের দোকানে গিয়ে খাবার খাই নি এটি তো একেবারে অসম্ভব। বাদাম কিনে খোলা ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে দানা মুখে দিতে দিতে, মেলার মোজা উপভোগ করার আনন্দই আলাদা। চলতি ফিল্মের হাল্কা গান, বিদ্যুৎ চালিত নাগরদোলায় ঘোরাঘুরি, আলোকসজ্জা, প্রভৃতি অজস্র দৃশ্য মেলাটিকে সমৃদ্ধ করে রাখে। বেলুনওয়ালার "বেলুন চায় বেলুন" আর বাঁশিওয়ালার বাঁশির বিভিন্ন রকমের আওয়াজ মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। ভিড়, চেঁচামেচি, হট্টগোল, ঠেলাঠেলি, হাসি-কান্না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি, খুশির উচ্ছ্বাস, তাল পাতার বাঁশির আওয়াজ, মেলার অন্যতম আকর্ষণ।

মেলার সবচেয়ে করুণ দৃশ্য যেটা আমি অনুভব করেছিলাম – গরিব কিশোর কিশোরীরা পয়সার অভাবে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে যেন সমস্ত মেলার আনন্দ তাদের কাছে বিষন্ন ও দুঃখ ভরা। মেলা তাই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মিলিত কোলাহলের ঐকতানে মানুষের জীবননাট্যের এক অভিনব রঙ্গমঞ্চ।

রথের মেলা: আমার স্মৃতি: ছয়

লেখা: সুরভী ঘোষ (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,20)

বর্ষার মেঘ মেদুর আকাশ, সজল প্রকৃতির বুকে কামিনী, চাঁপা, মালতীলতাদের মিষ্টি সুবাস ও বর্ষণস্নাত পাখিদের কলকাকলিতে ভরা যেকটি দিন মনে দাগ কেটে যায় তারমধ্যে অন্যতম রথের দিনটি। বৃষ্টি ক্লান্ত প্রকৃতি সেজে ওঠে আনন্দানুষ্ঠানের আবেশে, নিজস্ব ঢঙে, আপন ছন্দে। গ্রামীণ মেলার কথা উঠলেই বাঙালি চোখে যে ছবি ওঠে ভেসে ওঠে তা হলো রথের মেলা। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথ যাত্রার প্রারম্ভ; পুরীতে জগন্নাথের রথ, মায়াপুর ইসকনের রথ, মহিষাদলের রথ, শ্রীরামপুরের রথ, হুগলিতে রাজবলহাটের রথ, বেলঘরিয়ায় রথতলার রথ, আদ্যাপীঠের রথ – রথ সর্বত্র বর্তমান।

রথের দিন বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, আর হবে নাই বা কেন! বর্ষাকালে বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাচ্চারা কতদিন ধরে পরিকল্পনা করে নিজের ছোট্ট কাঠের রথকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করে। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা বা সোজা রথ, উল্টোরথ যাইহোক আসল আকর্ষণ আমার কাছে রথের মেলার। বন্ধুবান্ধব, ভাইবোনকে সাথে করে নিয়ে রথ টানা এক বিশাল উপলব্ধি। সাথে পাপড় ভাজা জিলিপি খেয়ে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মজাই অন্য রকম। আছে অন্যান্য খাবারের দোকান ছোট নাগরদোলা, সবই আকর্ষণের মাত্রাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

দিনটির আছে আলাদাই এক স্বাধীনতা। হঠাৎ করে বৃষ্টির মধ্যে আটকে গিয়ে, নকুল দানা আর বাতাসা (যা ঠাকুরের প্রসাদ) চিবিয়ে, শরীর-মনের ক্লান্তি ভুলে মাতোয়ারা আমরা সবাই অর্থাৎ বাঙালি।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্মরণে পুরী শহরে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল রথ যাত্রার। বর্তমানে শুধু বঙ্গ বা ওড়িশা বাসীর নয়, রথযাত্রার মেলা গোটা বিশ্বের। আমার স্মৃতিতে "ছোট-বড় দোকান কত, জিলিপি আর পাঁপড় ভাজা; পাড়ার মাঠে বসেছে আজ, রথযাত্রার মেলা"।

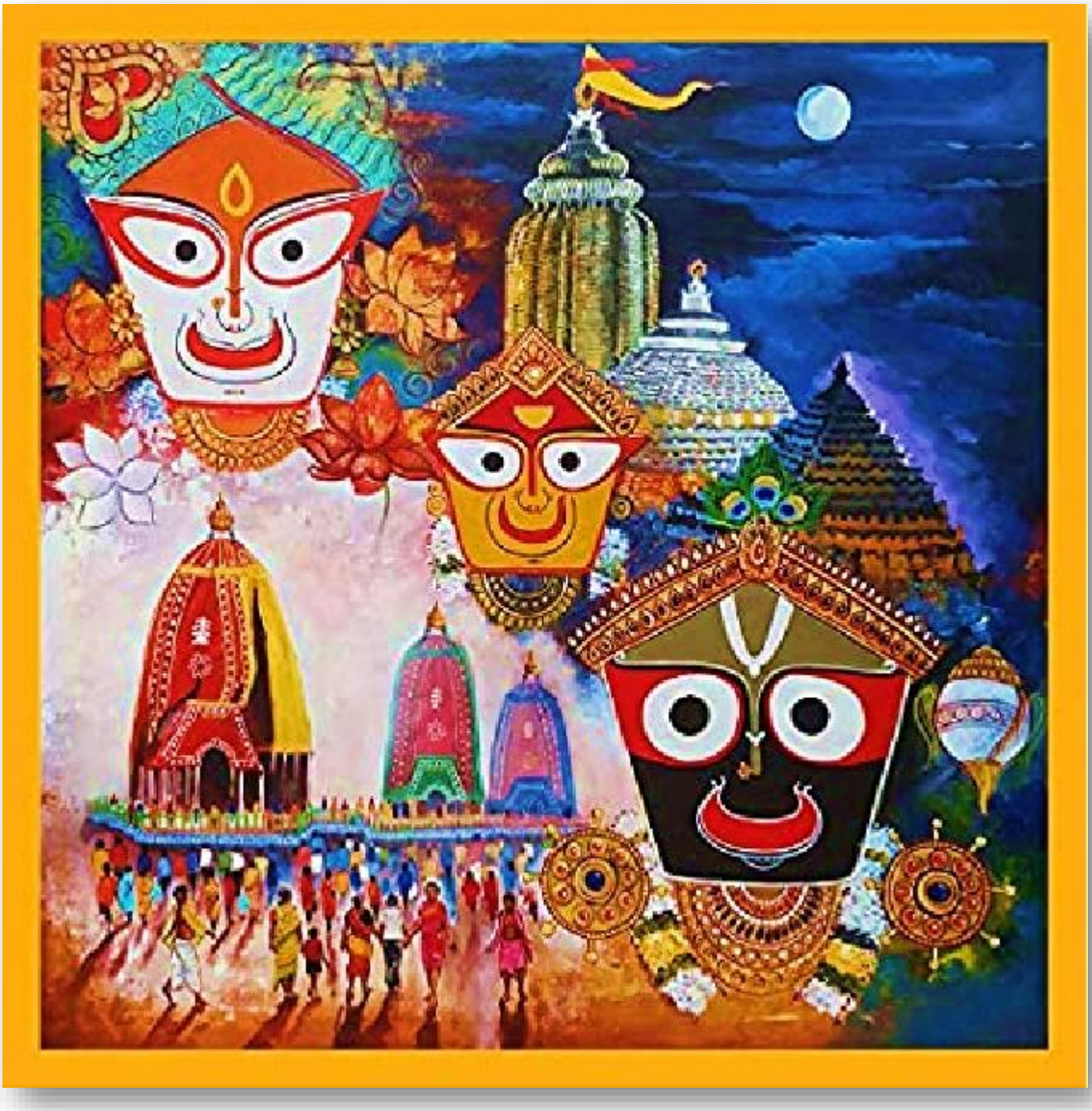

সম্পাদনা: **আমার স্মৃতি** প্রকাশনার পক্ষ হতে ড: অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান (সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: 27শে আগষ্ট, 2021